বিভাজিত বাংলা ও উত্তর-পূর্ব ভারতে জাতি চেতনার বিবর্তন: নমঃশূদ্র জাতির একটি আলোচনা (১৯৪৭-২০২১)

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতিহাস বিভাগের অধীনে পিএইচ.ডি. (আর্টস) উপাধির জন্য প্রদত্ত গবেষণা সন্দর্ভের সারসংক্ষেপ

গবেষক

কৃষ্ণেন্দু বিশ্বাস

ইতিহাস বিভাগ

রেজিস্ট্রেশন নং AOOHI0200316

তত্ত্বাবধায়ক

ড. রূপ কুমার বর্মন

অধ্যাপক

ইতিহাস বিভাগ

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

কলকাতা ৭০০০৩২

২০২৩

বিভাজিত বাংলা ও উত্তর-পূর্ব ভারতে জাতি চেতনার বিবর্তন: নমঃশূদ্র জাতির একটি আলোচনা (১৯৪৭-২০২১)

বিংশ শতাব্দীতে আধুনিক ইতিহাসের ধারায় নবতম শৈলী হিসেবে নিম্নবর্গ সম্পর্কিত ইতিহাসচর্চা (Subaltern Studies) সংযোজনের মধ্য দিয়ে সমাজের প্রান্তিক অংশের প্রতি নতুন দৃষ্টিভঙ্গির দিগন্ত উদ্ভাসিত হয়েছে। প্রান্তিকতার ইতিহাসচর্চার এই অভিঘাতে আধুনিক ভারত তথা বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের ঐতিহাসিক ও সমাজ বিজ্ঞানীদের কাছে, অন্যান্য অনেক নতুন বিষয়ের পাশাপাশি জাতি ও বর্ণ সম্পর্কিত আলোচনা অন্যতম আকর্ষণের বিষয় হয়ে উঠে এসেছে। এই প্রয়াসের মধ্যে দিয়ে ভারতের বিভিন্ন প্রান্তের জাতি সম্পর্কিত চর্চা উঠে আসতে দেখা যায়, যা ভারতীয় ইতিহাসে নতুন মাত্রা সংযোজন করেছে। আলোচ্য *'বিভাজিত বাংলা ও উত্তর-পূর্ব ভারতে জাতি চেতনার বিবর্তন: নমঃশূদ্র জাতির একটি আলোচনা (১৯৪৭-২০২১)'* গবেষণা সন্দর্ভেটি এই শাখার অন্তর্ভুক্ত বিষয় হিসেবে পরিগণিত হয়।

ঔপনিবেশিক পর্বে ভারতীয় শাসনতান্ত্রিক ভিত্তি দৃঢ় করার উদ্দেশ্যে সংঘটিত বিভিন্ন গবেষণার প্রতিবেদনে ভারতীয় জাতি ও বর্ণের কথা উঠে আসতে দেখা যায়। এর পাশাপাশি পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সামাজিক ন্যায়ের ধারনার প্রসারের মধ্য দিয়ে ভারতের বিভিন্ন প্রান্তের নিষ্পেষিত জাতির মধ্যে চেতনা বা জাগরণ ঘটতে থাকে। চেতনা বা Consciousness হল মানব মনের একটি ধর্ম বা বৈশিষ্ট্য। এ বিষয়টিকে আরও অনেকগুলি মানসিক বৈশিষ্ট্যের সমষ্টি হিসেবে গণ্য করা হয়। যেমন আত্মমাত্রিকতা, আত্মচেতনা, অনুভূতিশীলতা, পৃথকীকরণ ক্ষমতা, এবং নিজের সত্তা ও আশেপাশের পরিবেশের মধ্যকার সম্পর্ক অনুধাবনের ক্ষমতা।

অর্থাৎ চেতনার উন্মেষের সঙ্গে পারিপার্শ্বিক সামাজিক পরিমণ্ডলরে মধ্যে নিজের পরিচিতি (Identity) ও অবস্থান (Position) বুঝে নেওয়ার প্রচেষ্টা কার্য-কারণ সম্পর্কের

বাঁধনে গ্রন্থিত থাকে। এই বিষয়টি উপজীব্য করে ভারতীয় জাতি আন্দোলন সমূহকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে, কোন জাতির সচেতনার সঙ্গে তাদের সামাজিক অবস্থানের গভীর সম্পর্ক বিদ্যমান।

এই চেতনার উন্মেষ ও তাদের সামাজিক অবস্থান সম্পর্কিত উদ্বেগ ভারতের বিভিন্ন অংশে জাতি আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটায়। এই প্রেক্ষিতে জাতি চর্চা নতুন আঙ্গিকে পর্যালোচনা ও গবেষণার বিষয় হয়ে উঠেছে। এর পাশাপাশি বিষয়গুলোকে পুনরন্বেষণের মাধ্যমে, প্রাসঙ্গিক ঐতিহাসিক ঘটনাক্রমে সজ্জিত করে এবং নতুন দৃষ্টিভঙ্গিতে বিশ্লেষণ করে পুনর্লিখিন শুরু হয়েছে।

ইতিমধ্যেই ঔপনিবেশিক ও উত্তর ঔপনিবেশিক ভারতের সমাজ ও রাষ্ট্রের ইতিহাসে বিষয়টির সুনির্দিষ্ট গ্রহণযোগ্যতা তৈরি হয়েছে। প্রসঙ্গক্রমে বাংলা (Bengal Province) এর জাতি আন্দোলন সাম্প্রতিকালের সমাজ বিজ্ঞানের গবেষণায় অনন্য স্থান অধিকার করে আছে। অবিভক্ত বাংলায় অনুসুচিত (Schedule) জাতির অন্তর্ভুক্ত রাজবংশী, পৌন্ড্রক্ষত্রিয়, বাগদি, হারি, মালো, নমঃশূদ্র এবং অন্যান্য জনগোষ্ঠীর জাতি আন্দোলন, ভারতীয় ইতিহাসের পাতায় সমুজ্জ্বল।

এই সকল আন্দোলনের মধ্যে নমঃশূদ্র জাতি আন্দোলন স্বতন্ত্র স্থান অধিকার করে আছে। নমঃশূদ্র জনগোষ্ঠীর মানুষজন মূলত: অবিভক্ত বঙ্গদেশের দক্ষিণ-পূর্ব অংশ বা বর্তমান বাংলাদেশের খুলনা, ঢাকা ও বরিশাল বিভাগ (তৎকালীন ঢাকা, ফরিদপুর, বরিশাল, যশোর, বাখরগঞ্জ প্রভৃতি জেলা) এর বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে বসবাস করতেন। ১৯৩১ সালের জনগণনা অনুসারে বঙ্গপ্রদেশ (Bengal Province)-এ নমঃশূদ্র জাতির মানুষের সংখ্যা ছিল ২০,৯৪,৯৫৭ জন।

ইতিহাসের প্রতি দৃষ্টি দিলে দেখা যাবে যে, নমঃশূদ্র জাতিটির এক সুদীর্ঘ সংগ্রামের ঐতিহ্য আছে। বাখরগঞ্জ এবং ফরিদপুর অঞ্চলে ১৮৭০ এর দশকে সামাজিক অসন্মানের বিরুদ্ধে নমঃশূদ্র জাতির বিক্ষোভ (Agitation) প্রদর্শন। পরবর্তীতে জাতির অসম্মান সূচক 'চণ্ডাল' নামের পরিবর্তন করে 'নমঃশূদ্র' নাম গ্রহনের জন্য দীর্ঘ সংগ্রাম (১৯১১) প্রভৃতির কথা বলা যায়। এই সকল সংগ্রাম তাদের ঐক্যবদ্ধতা এবং সু-সাংগঠনিক ভিত্তির দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

এই ঐক্যবদ্ধতার শক্তিকে কাজে লাগিয়ে দীর্ঘকাল ধরে শিক্ষা ও সমাজ সংস্কারের মধ্যে দিয়ে নমঃশূদ্র জনগোষ্ঠী নিজেদের জাতি চেতনাকে উদ্বুদ্ধ করতে সক্ষম হয়েছিল। এই সুদীর্ঘ প্রক্রিয়ায়, হরিচাঁদ ঠাকুর এবং পরবর্তীতে গুরুচাঁদ ঠাকুর নমঃশূদ্র জাতির নেতৃত্বের এক অসামান্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। জাতি চেতনার শক্তিকে অবলম্বন করে, নমঃশূদ্র জনগোষ্ঠী পূর্ববঙ্গ (বর্তমান বাংলাদেশ) এর বিভিন্ন জেলায় নিজেদের অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক অবস্থানকে স্থিতিশীল ভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়ে ছিল। যা, তাদের আর্থিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থানকে ঊর্ধ্বগতি দান করেছিল।

ঔপনিবেশিক শাসনের অবসানের পর, তাদের দীর্ঘ সংগ্রাম ও সংস্কারের মাধ্যমে গড়ে তোলা জাতি চেতনা ও সামাজিক অবস্থানের উপর সংকট ঘনীভূত হয়ে ওঠে। স্বাধীনতা পরবর্তীতে বঙ্গপ্রদেশটি ধর্মীয় ও রাজনৈতিক স্বার্থে বিভাজিত হয়ে পড়ে। বাংলা বিভাজন (১৯৪৭) এর ফলে, অন্যান্য হিন্দু সম্প্রদায়ের পাশাপাশি নমঃশূদ্র অধ্যুষিত অঞ্চলটি ধর্মের ভিত্তিতে গঠিত পূর্ব-পাকিস্তানের অংশে রয়ে যায়।

এই পরিস্থিতিতে পাকিস্তানের অংশে থাকা অন্যান্য হিন্দু সম্প্রদায়ের মত নমঃশূদ্র জাতি দোটানা পরিস্থিতির মধ্যে পতিত হয়। একদিকে ভারতীয় জাতীয়তাবাদের সঙ্গে সম্পৃক্ত জাতিটি রাতারাতি নবগঠিত ইসলামিক রাষ্ট্রের অংশ হয়ে ওঠে। সে ক্ষেত্রে, তাদের পূর্ববর্তী

জাতীয়তাবাদী পরিচিতি সংকটাপন্ন হয়। অপরদিকে পূর্বপুরুষের বাসস্থান ত্যাগ করে ভারতে প্রবেশ করলে, তাঁরা হয়ে পড়েন বাস্তুচ্যুত শরণার্থী। এমতাবস্থায় নমঃশূদ্র জাতিটি বহুধা বিভক্ত হয়ে তাদের, ঐক্যবদ্ধ চরিত্র হারিয়ে ফেলতে থাকে। বাংলা ভাগ (১৯৪৭) এর ফলে উদ্ভূত এই নতুন পরিস্থিতি নমঃশূদ্র জাতিকে নতুন জীবন সংগ্রামের দিকে ঠেলে দেয়।

নব উদ্ভূত পরিস্থিতিতে অন্যান্য বাস্তুচ্যুত পরিবারের মত নমঃশূদ্র জাতির মানুষ পূর্ব পাকিস্তান থেকে অভিবাসিত হয়ে ভারতের পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, ত্রিপুরা প্রভৃতি রাজ্যে আশ্রয় গ্রহণ করতে থাকেন। অপরদিকে কিছু সংখ্যক নমঃশূদ্র জাতির মানুষ তাঁদের পূর্বপুরুষের বাসস্থান আঁকড়ে ধরে বঙ্গের পূর্ব অংশে অর্থাৎ নবগঠিত পূর্ব পাকিস্থান (বর্তমান বাংলাদেশ) এ থেকে যান।

১৯৪৭ পরবর্তী ভারতীয় ইতিহাস চর্চায় নমঃশূদ্র জাতি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের নদীয়া, উত্তর ২৪ পরগনা, জলপাইগুড়ি এবং বিভিন্ন জেলায় বসবাসকারী নমঃশূদ্র মানুষের সংখ্যা ৩৮ লাখেরও বেশি। ১৯৪৭ এর পর বাস্তুচ্যুত হয়ে নমঃশূদ্র জনগোষ্ঠীর নেতৃত্ব স্থানীয় ব্যক্তিবর্গ সহ একটি বড় অংশ পশ্চিমবঙ্গে পুনর্বাসিত হয়ে পড়েন। এই ঘটনা প্রবাহে বিভিন্ন ঘাত প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে নমঃশূদ্র জাতি চেতনা তথা জাতি রাজনীতির ভরকেন্দ্র পূর্ববঙ্গ থেকে পশ্চিমবঙ্গে স্থানান্তরিত হতে দেখা যায়। এই ঘটনা পরম্পরায় নমঃশূদ্র জাতি ক্রমশ পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতীয় রাজনীতিতে অংশীদার হয়ে উঠে এসেছে। জাতীয় রাজনীতিতে নমঃশূদ্র জাতির এই সম্পৃক্ততা, তাদের সামাজিক অবস্থানের ক্রমবিবর্তন ঘটিয়ে চলেছে।

পশ্চিমবঙ্গের বাইরে ভারতীয় ভু-খণ্ডে বসবাসকারি নমঃশূদ্র জাতির ইতিহাস আলোচনায় আসাম ও ত্রিপুরা রাজ্য দুইটির বিশেষ গুরুত্ব আছে। আসামে এই জনগোষ্ঠীর মানুষের সংখ্যা প্রায় ৬ লাখ এবং ত্রিপুরায় ২ লাখের বেশি। এছাড়া মেঘালয়, মনিপুর প্রভৃতি

রাজ্যে বসবাসকারী নমঃশূদ্র জাতির মানুষ, ভারতীয় সমাজ, রাজনীতি ও সংস্কৃতিতে গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার হয়ে অবস্থান করে আছেন। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ পরবর্তী সময় বাঙালি অনুপ্রবেশ বিষয়টিকে কেন্দ্র করে আসামে ১৯৭৯ থেকে ১৯৮৫ সাল পর্যন্ত আসাম ছাত্র পরিষদের নেতৃত্বে উত্তাল গণআন্দোলনের ঢেউ আছড়ে পড়ে। ১৯৮৫ সালে আসাম অ্যাকর্ড (Assam accord 1985) স্বাক্ষর হওয়ার পর এই সমস্যার সাময়িক প্রশমন হলেও, এখনো তার সর্বাত্মক সমাধান সম্ভব হয়নি। এই বিষয়টি নমঃশূদ্র জাতিকে আসামের বাঙালি জনগোষ্ঠীর অংশ হিসেবে পরিচিতি আরোপ করেছে।

অপরদিকে, দেশভাগের পর পূর্ব পাকিস্তানে থেকে যাওয়া হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে নমঃশূদ্র জনগোষ্ঠী পরিবর্তিত রাষ্ট্রীয় ও রাজনীতিক কাঠামোয় সংকটাপন্ন হয়ে পরতে থাকে। ধর্মীয় সাম্প্রদায়িক পরিমণ্ডলে পূর্ব পূর্ব পাকিস্তানের নমঃশূদ্র অধ্যুষিত অঞ্চলগুলি বাস্তুচ্যুতি জনিত অভিবাসনের প্রভাবে ধীরে ধীরে জনবিন্যাসগত পরিবর্তনের সম্মুখীন হয়ে পড়ে। হিন্দু তথা নমঃশূদ্ররা দলে দলে অভিবাসিত হয়ে পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারত অভিমুখে আসতে থাকে অথবা ধর্ম পরিবর্তন করে মুসলিম সাম্প্রদায়িক আগ্রাসন থেকে বাঁচার পথ খুঁজে নেন। অতঃপর খুবই স্বল্প সংখ্যক নমঃশূদ্র জাতির মানুষই পূর্বপুরুষের বাসস্থান আঁকড়ে ধরে বঙ্গের পূর্ব অংশে অর্থাৎ নবগঠিত পূর্ব পাকিস্থান (বর্তমান বাংলাদেশ) এ থেকে যান। ফলস্বরূপ সেখানে ঐক্যবদ্ধ নমঃশূদ্র জাতি আন্দোলনে ভাটা পড়তে শুরু করে। একদা নমঃশূদ্র জাতির চেতনা উত্থানের ভিত্তি ভূমিতেই তাদের জাতি আন্দোলন অবলুপ্ত হয়।

বর্তমানে এই জনগোষ্ঠীর অর্ধকোটির বেশি মানুষজন ভারত, বাংলাদেশ ও বিভিন্ন দেশে বসবাস করেন। বাংলার জাতিচর্চার ইতিহাসে বিভিন্ন সময় দেশভাগ পূর্ববর্তী নমঃশূদ্র জাতির আলোচনা উঠে আসলেও, বাংলা বিভাজন পরবর্তী সময়ে পশ্চিমবঙ্গ, বাংলাদেশ এবং উত্তর-পূর্ব ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে নমঃশূদ্র জনগোষ্ঠীর আত্মপরিচিতি পুনর্গঠনে জাতি চেতনা

এবং সামাজিক অবস্থানের স্বতন্ত্র ইতিহাস গবেষণা মূলক পর্যালোচনার বাইরে রয়ে গেছে, যা আলোচ্য সন্দর্ভের মূল উপজীব্য বিষয়।

গবেষণার পরিধি:

'বিভাজিত বাংলা ও উত্তর-পূর্ব ভারতে জাতি চেতনার বিবর্তন: নমঃশূদ্র জাতির একটি আলোচনা (১৯৪৭-২০২১)' শিরোনামক গবেষণা পত্রটি আলোচনার ক্ষেত্রে ১৯৪৭ এর দেশ বিভাজনের পরবর্তী সময় থেকে ২০২১ সালের পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচন পর্যন্ত নির্ধারিত সময় পর্বের মধ্যে সংগঠিত জাতি চেতনার মধ্য দিয়ে রাজনৈতিক পরিসরে উত্থান এবং তার সঙ্গে সামাজিক অবস্থানের সম্পর্কটি কার্য-কারণের সম্পর্কের ভিত্তিকে উপজীব্য করে আলোচনা করা হয়েছে। ১৯৪৭ থেকে ২০২১ সালের কাল পর্বে তিনটি ভিন্ন স্থানের ভিন্ন ভিন্ন পরিমণ্ডলে নমঃশূদ্র জাতি চেতনার বিবর্তনকে তুলে ধরে আলোচনাটি আগ্রসর হয়েছে।

এক্ষেত্রে এই তিনটি স্থান হল বিভাজিত বাংলা অর্থাৎ ঔপনিবেশিক বঙ্গপ্রদেশের বিভাজিত দুইটি অংশ পশ্চিমবঙ্গ এবং বর্তমান বাংলাদেশ। এই দুইটি ক্ষেত্রও ছাড়া তৃতীয় স্থান হিসেবে উত্তর-পূর্ব ভারতের আসাম ও ত্রিপুরা রাজ্যে নমঃশূদ্র জাতি চেতনা এবং পরিচিতির বিবর্তন আলোচনা করা হয়েছে।

জাতি চেতনার বিবর্তনের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে পরিবর্তিত হয়, কোন ব্যক্তি বা জনগোষ্ঠীর পরিচিতি। এ ক্ষেত্রে নমঃশূদ্র জাতি পরিচিতির আলোচনা বিবর্তিত হবে, ঔপনিবেশিক পর্বে নির্মিত তপশিলি পরিচিতির নিরিখে। অর্থাৎ স্বাধীনতা (১৯৪৭) পরবর্তী সময় থেকে ২০২১ সালের পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচন পর্যন্ত কালপর্বে পশ্চিমবঙ্গ, বাংলাদেশ এবং উত্তর-পূর্ব ভারতের আসাম এবং ত্রিপুরা রাজ্যে নমঃশূদ্র জাতির পরিচিতি

নির্মাণ হওয়ার ক্ষেত্রে যে পার্থক্য বা ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়, তার সামাজিক এবং রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট, আলোচ্য গবেষণা সন্দর্ভের পরিধিতে উঠে এসেছে।

পূর্ববর্তী গবেষণার প্রতি অবলোকন:

জাতি বা বর্ণ চর্চার ইতিহাস বর্তমান ভারত তথা বিশ্বের ইতিহাসে প্রাসঙ্গিক ও বহুচর্চিত একটি বিষয়। ঔপনিবেশিক ভারতীয় শাসনতন্ত্রকে সুবিন্যাস্ত করার প্রয়োজনীয়তা বোধ থেকে ভারতের সমাজ-সংস্কৃতিকে বোঝার জন্য বিদেশি আমলাতান্ত্রিক প্রতিনিধিদের অনুসন্ধান ও গবেষণামূলক প্রয়াস শুরু হয়। যার ফলস্বরূপ ১৭৮৪ সালের ১৫ জানুয়ারি স্যার উইলিয়াম জোনসের তত্ত্বাবধানে ব্রিটিশ ভারতের তদানীন্তন রাজধানী কলকাতার ফোর্ট উইলিয়ামে এশিয়াটিক সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সংস্থাটি স্থাপনের মধ্য দিয়ে ভারতীয় সমাজ সংস্কৃতি তথা জাতি চর্চার প্রাতিষ্ঠানিক গবেষণা শুরু হয়।

প্রশাসনিক প্রতিনিধিদের বিভিন্ন প্রতিবেদন ও গবেষণামূলক লেখায় ভারতীয় সমাজ সংস্কৃতির বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের পাশাপাশি জাতি বা বর্ণবৈষম্যের বিষয়টিও উঠে আসে। ফ্রান্সিস বুকানন হ্যামিল্টন, উইলিয়াম উইলসন হান্টার, হাবার্ট হোপ রিসলে, জেমস ওয়াইজ, এছাড়া, ১৮৭২ সাল থেকে বিভিন্ন আদমশুমারি প্রভৃতি প্রতিবেদন গুলিতে বাংলার নমঃশূদ্র এবং অন্যান্য নিষ্পেষিত জাতির ইতিহাস উঠে আসতে শুরু করে। উক্ত লেখনিগুলি মূলত ছিল ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক সরকারের শাসনতান্ত্রিক সুবিধার্থে এবং ব্যক্তিগত উদ্যোগে প্রকাশিত প্রতিবেদন। এই প্রতিবেদন গুলির মাধ্যমে ভারতীয় সমাজের জাতি ও বর্ণগত বৈষম্যের বিষয়টি আলোচনায় উঠে আসতে থাকে।

এর পাশাপাশি পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রসার এবং সামাজিক ন্যায় ধারণা ধারণা ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের নিষ্পেষিত মানুষের মধ্যে আত্মচেতনার উন্মেষ ঘটায়। এই চেতনার

বহিঃপ্রকাশ দেখা যায় ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের জাতি আন্দোলনের মধ্য দিয়ে। তখন থেকে ঔপনিবেশিক গবেষকের পাশাপাশি ভারতীয় সমাজবিজ্ঞান ও ইতিহাসে বর্ণ ও জাতি সম্পর্কিত আলোচনা শুরু হয়।

এর প্রাথমিক সূত্রপাত দেখাযায়, ১৮৯০ দশকে যোগেন্দ্র নাথ ভট্টাচার্যের 'Hindu Caste and Sects' গ্রন্থে। তিনি ভারতের বর্ণ ব্যবস্থা তথা জাতি ব্যবস্থার উৎপত্তি ও বিকাশ সম্পর্কে আলোচনা করেন। পরবর্তীতে, শ্রীধর ভেঙ্কটেশ কেটকার, জি.এস. ঘুরে, এম.এন. শ্রীনিবাস, এ.আর. দেশাই, ইরাবতী কার্ভে প্রভৃতি গবেষকের হাত ধরে জাতি ও বর্ণ চর্চা প্রাতিষ্ঠানিক গবেষণায় প্রতিষ্ঠিত হয়।

১৯৫২ সালে এম.এন. শ্রীনিবাস দক্ষিণ ভারতের কুর্গ জাতির সামাজিক অবস্থানের ঊর্ধ্বগতিময়তার উপর ভিত্তি করে যে সংস্কৃতায়ন (Sanskritization) তত্ত্বের অবতারণা করেন, তা ভারতীয় বর্ণবৈষম্য বিরোধী আন্দোলনকে দেখার ক্ষেত্রে এক নতুন মাত্রা যোগ করেছে।

১৯৩১ সালে প্রকাশিত নৃপেন্দ্র কুমার দত্তের 'Origin and Growth of Caste in India' গ্রন্থে ঋক বৈদিক যুগ থেকে ১৯৩০ সাল পর্যন্ত জাতি বর্ণ ব্যবস্থার উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ পর্যালোচনা করেছেন। তাঁর গ্রন্থের দ্বিতীয় খন্ডে বাংলার পাটনি, রাজবংশী, নমঃশূদ্র এবং অন্যান্য জাতির সম্মানজনক জাতি পরিচিতি নির্মাণের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস তুলে ধরেছেন। অর্থাৎ ইতিপূর্বেই মি: দত্তের আলোচনায় সংস্কৃতায়ন সম্পর্কিত আলোচনার সূত্রপাত হয়েছিল। সামাজিক ঊর্ধ্ব গতিময়তার অপর একটি আলোচনা নির্মল কুমার বসুর ‘হিন্দু সমাজের গড়ন’ বইটিতেও পাওয়া যায়।

স্বাধীনতা পরবর্তী জাতি ব্যবস্থার আলোচনায় লুই ডুমো, তাঁর ‘*Homo Hierarchicus*, 1966’ গ্রন্থে সামাজিক অগ্রগণ্যতায় নির্ভেজাল বা খাঁটি জাতির তত্ত্ব তুলে

ধরেছেন। পরবর্তী বিভিন্ন সময়ের লেখায় পেশাগত বিভাজন, জাতি বা শ্রেণীর গতিময়তা, সামাজিক গতিময়তা প্রভৃতি তত্ত্ব উঠে আসে। এই তত্ত্ব সমূহ ভারতীয় বর্ণ ও জাতি ব্যবস্থার বিভিন্ন আঙ্গিকে তুলে ধরেছে।

১৯৮০-এর দশকে নিম্নবর্গের ইতিহাস চর্চা (Subaltern Studies)-এর উত্থান সমাজের প্রান্তিক অংশের ইতিহাস লেখায় নতুন দিগন্ত উন্মোচন করে। বিষয়টি জাতি বা বর্ণ চর্চার ইতিহাস লেখার প্রক্রিয়ায় এক নতুন উদ্যম নিয়ে এসেছে।

পশ্চিমবঙ্গের প্রাতিষ্ঠানিক বর্ণ ও জাতি চর্চার ক্ষেত্রে অগ্রগণ্য ভূমিকা পালন করেছে শেখর বন্দ্যোপাধ্যায়ের '*Caste, Protest and Identity in Colonial India: The Namusudras of Bengal 1872-1947'* (New Delhi, Oxford University Press, 2011), এবং *'Caste, Culture and Hegemony: Social Domination in Colonial Bengal'* (New Delhi, Sage Publications, 2004), প্রভৃতি গবেষণামূলক গ্রন্থ। তিনি ঔপনিবেশিক পর্বের নমঃশূদ্র জনগোষ্ঠীর সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ইতিহাস তুলে ধরেছেন। এই গ্রন্থ সমূহে স্বাধীনতা তথা দেশভাগ পরবর্তী নমঃশূদ্র সম্প্রদায়ের ইতিহাসের ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়নি।

বাংলার জাতি আন্দোলন চর্চায় রাজবংশী আন্দোলন অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। স্বরাজ বসু তাঁর *'Dynamics of a caste movement: The Rajbanshis if North Bengal, 1910-1947'* গ্রন্থে ঔপনিবেশিক পর্বের রাজবংশী আন্দোলন তুলে ধরেছেন। রাজবংশী জাতির ইতিহাস পর্যালোচনায় রূপ কুমার বর্মণ, তাঁর *'Contested Regionalism', (*New Delhi, Abhijit Publications, 2007) গ্রন্থে উত্তর-পূর্ব ভারত এবং কোচবিহারের বিচ্ছিন্নতাবাদি জাতি রাজনীতির প্রেক্ষাপট তুলে ধরেছেন। যুথিকা বর্মা, তাঁর *'জাতি-রাজনীতি থেকে জাতীয় রাজনীতি: উপেন্দ্রনাথ বর্মন (১৮৯৮- ১৯৮৮) ও তার সমকালীন উত্তরবঙ্গ'*

গ্রন্থে রাজবংশী জাতির জাতীয় রাজনীতিতে উন্নীতকরণের কারিগর উপেন্দ্রনাথ বর্মনের ক্ষত্রিয় আন্দোলনের প্রেক্ষাপট তুলে ধরেছেন।

স্বাধীনতা পরবর্তী তপশিলি জাতির প্রাতিষ্ঠানিক আলোচনায় রূপ কুমার বর্মণের, *'Partition of India and Its Impact on Scheduled Castes of Bengal'* (Delhi: Abhijeet publications, 2012)।' বইটিতে তিনি, ভারত ভাগের পরিপ্রেক্ষিতে পশ্চিমবঙ্গের তপশিলি জাতির উপর কি প্রভাব পড়েছিল, তা নিয়ে আলোচনা করেছেন। '*Right-Left-Right and Caste Politics: The Scheduled Castes in West Bengal Assembly Elections' (from 1920 to 2016),* Sage Publications, 2018, বইটিতে তিনি স্বাধীনতা পরবর্তীকালে, সময় পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের তপশিলি জাতির রাজনৈতিক পরিবর্তনের একটি প্রাঞ্জল চিত্র তুলে ধরেছেন। তাঁর '*জাতি- রাজনীতি, জাতপাত ও দলিত প্রতর্ক পশ্চিমবঙ্গের প্রেক্ষাপটে তপসিলি জাতির অবস্থান,* (অ্যালফাবেট বুক্স, ২০১৯)' বইটিতে সমাজের মননের ভিতরে লুকিয়ে থাকা বর্ণবৈষম্যের বীজ ও পশ্চিমবঙ্গের জাত রাজনীতিতে দলদাস তৈরি হওয়ার প্রক্রিয়াকে তুলে ধরেছেন। *'Caste, Politics, Casteism and Dalit Discourse: The Scheduled Castes Of West Bengal'* (New Delhi, Abhijit Publications, 2020) বইটিতে পশ্চিমবঙ্গের সকল তপশিলি জাতির আত্মপরিচিতি এবং রাজনীতির উত্থান তুলে ধরেছেন। *'Migration, State Policies and Citizenship: A Historical study on India', Bangladesh and Bhutan' (*New Delhi, Abhijit Publications, *2021)* গ্রন্থে উদ্বাস্তু সমস্যার কথা তুলে ধরেছেন। 'পরিবর্ত অনুসন্ধান: রাষ্ট্র নাগরিকত্ব বাস্তুচ্যুতি ও ইতিহাসচর্চা, (কলকাতা, গাঙচিল, ২০২২) বইটিতে স্মৃতিচারণের মধ্য দিয়ে পশ্চিমবঙ্গের জাতি বৈষম্য এবং তার সঙ্গে সম্পর্কিত বিভিন্ন রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি

আলোচনা করেছেন। তাঁর বইগুলিতে পশ্চিমবঙ্গের সকল তপশিলি জাতির আলোচনা থাকলেও, স্বতন্ত্র নমঃশূদ্র জাতির সামগ্রিক ইতিহাস তুলেধরা হয়নি।

মালো জাতির ইতিহাস চর্চায় রূপ কুমার বর্মণ তাঁর *'Caste, Class and Culture: The Malos, Adwaita Malla Barman and History of India and Bangladesh* (New Delhi, Abhijit Publications, 2020) গ্রন্থে মালো জাতির চেতনার উত্থান এবং সামাজিক ইতিহাস আলোচনা করেছেন। এর পাশাপাশি অদ্বৈত মল্লবর্মণের লেখায় মালো জাতির সামাজিক বিবরণ উঠে এসেছে।

বাংলার পৌন্ড্র জাতির ইতিহাস চর্চায় কৃষ্ণ কুমার সরকার তাঁর, *জাতি আন্দোলন থেকে রাজনৈতিক চেতনার বিকাশ: বাংলার পৌন্ড্র জাতির একটি বিশ্লেষণ (১৯১১-২০১১)* গবেষণা পত্রে পৌন্ড্র জাতির ১০০ বছরের ইতিহাসে, জাতির চেতনা থেকে রাজনৈতিক চেতনা উত্তরণের ইতিহাস পর্যালোচনা করেছেন। মিলন রায় তাঁর *'বাংলার বাগদি জাতি: জীবনধারা সংগ্রাম ও বিবর্তন'* গবেষণা পত্রেটিতে বাগদি জাতির সামাজিক ইতিহাস বর্ণনা করেছেন।

নমঃশূদ্র জাতির ইতিহাস লেখার ক্ষেত্রে শেখর বন্দ্যোপাধ্যায় পরবর্তী প্রাতিষ্ঠানিক গবেষণার ক্ষেত্রে মনোশান্ত বিশ্বাস তাঁর, *'বাংলার মতুয়া আন্দোলন সমাজ সংস্কৃতি রাজনীতি'* (সেতু প্রকাশনী, কলকাতা, ২০১৬), বইটির ভূমিকায় ভারতীয় দলিত আন্দোলনের ইতিহাস চর্চার ধারাগুলিকে আলোচনা করেছেন এবং বিভিন্ন অধ্যায়ে মতুয়া ধর্মের তাত্ত্বিক আদর্শবাদ, সমাজ সংস্কার আন্দোলন, শিক্ষা বিস্তার আন্দোলন, ১৮৭২ থেকে ১৯৪৭ সাল এবং ১৯৪৭ থেকে ১৯৯০ সাল এই দুইটি পর্বে ভাগকরে মতুয়া রাজনীতিকে বিশ্লেষণ করেছেন এবং পরিশিষ্টে মতুয়া মহাসঙ্ঘের পুনরুত্থান ও পশ্চিমবঙ্গের জাতীয় রাজনীতির নতুন সমীকরণ

বিশ্লেষণ করে বইটি সমাপ্ত করেছেন। এই বইটিতে মতুয়া ধর্মের সমাজ, সংস্কৃতি, রাজনীতির উপরেই বেশি গুরুত্বারোপ করা হয়েছে, সামগ্রিক নমঃশূদ্র জাতির ইতিহাসে নয়।

Rohidas Mondal তাঁর *'Dynamics of Caste, Religion, Culture and Politics 1872- 1971'* (New Delhi, Abhijit Publications, 2021) গ্রন্থে স্বাধীনতা-পূর্ব নমঃশূদ্র জাতির বর্ণ বৈষম্য আন্দোলন, তাদের ধর্মীয় আচার আচরণ এবং ১৯৭১ পর্যন্ত বঙ্গ রাজনীতিতে নমঃশূদ্র জাতির ইতিহাস পর্যালোচনা করেছেন। বইটি লেখার ক্ষেত্রে নমঃশূদ্র জাতি চেতনাকে গুরুত্ব দেওয়া হয়নি এছাড়া ২০২১ পর্যন্তও আলোচিত হয়নি। কানু হালদার তাঁর *'স্বাধীনতা উত্তর পর্বে বঙ্গীয় সমাজে মতুয়াদের রাজনৈতিক জাগরন এবং উত্তরণ'* (১৯৪৭ থেকে ২০১১ এর দশক) গ্রন্থে পশ্চিমবঙ্গ রাজনীতিতে মতুয়া মহাসংঘ তথা মতুয়া ধর্মের অংশীদারিত্ব নিয়ে আলোচনা করেছেন। বইটিতে নমঃশূদ্র জাতি চেতনা তথা জাতি রাজনীতির ইতিহাসের পূর্ণাঙ্গ আলোচনা পাওয়া যায় না।

দ্বৈপায়ন সেনের তাঁর '*The decline of the caste question: the marginalization of Dalit politics in Bengal' Cambridge University Press, 2018* বইটিতে যোগেন মন্ডলের নেতৃত্বে দেশ ভাগ সময় কালীন নমঃশূদ্র রাজনীতির বিভিন্ন দিক এবং ১৯৪৭ এর বাংলা ভাগ পরবর্তী উদ্বাস্তু আন্দোলনকে তুলে ধরেছেন। বইটিতে যোগেন মন্ডলের রাজনৈতি কেন্দ্রিক আলোচনা করা হয়েছে। এই গ্রন্থে দেশভাগ পরবর্তী নমঃশূদ্রদের সার্বিক ইতিহাস তুলে ধরা হয়নি।

শিপ্রা সেন তাঁর '*Tribes and castes of Assam' (assam, Gyan Publishing House, 2009),* গ্রন্থটিতে আসামের বিভিন্ন তপশিলি জাতি ও উপজাতিদের সামাজিক ও নৃতাত্বিক পর্যালোচনা করেছেন। গ্রন্থটিতে নমঃশূদ্র ইতিহসকে গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। প্রসূন

বর্মন তাঁর সম্পাদিত, 'অসম আন্দোলন ১৯৭৯-১৯৮৫' (কলকাতা, গাঙচিল, ২০২০), গ্রন্থে আসাম আন্দলনের প্রেক্ষাপট তুলে ধরেছেন।

অমলেন্দু দে তাঁর 'বাংলাদেশের জনবিন্যাস অনুপ্রবেশ সমস্যা', (কলকাতা, নলেজ পাবলিশিং হাউস), ২০১২ এবং 'প্রসঙ্গ অনুপ্রবেশ' গ্রন্থে বাংলাদেশের সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায়ের বর্ণনা তুলে ধরেছেন। এছাড়া মোহিত রায়ের, 'বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গ', (কলকাতা, ক্যাম্প, ২০১৩) এবং সালাম আজাদের 'হিন্দুরা কেন দেশত্যাগ করে চলে আসছে?' গ্রন্থে বাংলাদেশের সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায়ের আলোচনা করেছেন।

এছাড়া বিভিন্ন গ্রন্থে উদ্বাস্তু নমঃশূদ্র জাতির বিবরণ উঠে এসেছে। গ্রন্থ গুলির মধ্যে শ্রী হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা '*উদ্বাস্তু*' বইটি ১৯৭০ সালে সাহিত্য সংসদ থেকে প্রকাশিত হয়। এই বইটিতে শ্রী বন্দ্যোপাধ্যায় ১৯৪৭ এর দেশভাগ পরবর্তী পশ্চিমবঙ্গের উদ্বাস্তু পুনর্বাসন দপ্তরের মুখ্য সচিব ও মহাধ্যক্ষ থাকাকালীন অভিজ্ঞতার একটি প্রাঞ্জল বিবরণ দিয়ে ছেন। তাঁর লেখায় উঠে এসেছে দেশভাগ পরবর্তী সামাজিক, রাজনৈতিক চিত্র, উদ্বাস্তু পুনর্বাসন, সরকারী নীতি ও উদ্বাস্তুদের জীবন। বইটিতে দেশভাগকালীন সমাজ ও রাজনৈতিক ইতিহাস পাওয়া গেলেও নির্দিষ্টভাবে নমঃশূদ্র জাতির ইতিহাস লেখা হয়নি।

শৈবাল কুমার গুপ্তের প্রবন্ধ *'Dandakaranya: A Survey of Rehabilitation, The Ecomomic Weekly, ১৯৬৫'* দণ্ডকারণ্যের পুনর্বাসন ক্যাম্পের প্রশাসনিক অব্যবস্থার কথা তুলে ধরেছেন। প্রফুল্ল কুমার চক্রবর্তীর লেখা প্রতিক্ষণ পাবলিকেশন প্রাইভেট লিমিটেড থেকে প্রকাশিত '*প্রান্তিক মানব পশ্চিমবঙ্গে উদ্বাস্তু জীবনের কথা* (১৯৯৭)' বইটিতে স্বাধীনতা পরবর্তী পশ্চিমবঙ্গের উদ্বাস্তু সমস্যা, বিভিন্ন উদ্বাস্তু আন্দোলনকারী সংগঠন ও বিভিন্ন উদ্বাস্তু ক্যাম্পের বিবরণ দিয়ে ছেন। বইটিতে আলাদা করে নমঃশূদ্রদেরকে নিয়ে আলোচনা হয়নি।

অনিল সিংহের লেখা '*পশ্চিমবঙ্গ উদ্বাস্তু উপনিবেশ* (১৯৯৫)' বইটিতে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জবরদখল কলোনি, উদ্বাস্তু রাজনীতি প্রভৃতি আলোচনা করেছেন। বইটিতে আলাদা করে নমঃশূদ্রদের ইতিহাস পাওয়া যায় না। জয়া চ্যাটার্জী তাঁর, '*বাঙলা ভাগ হল হিন্দু সাম্প্রদায়িকতা ও দেশ বিভাগ ১৯২৩-১৯৪৭'* (২০০৩)' এবং '*দেশভাগের অর্জন বাংলা ও ভারত ১৯৪৭-১৯৬৭'* বই দুটিতে দেশভাগ পূর্ববর্তী ও পরবর্তী কংগ্রেস রাজনীতি এবং উদ্বাস্তু সমস্যা নিয়ে আলোচনা করেছেন। নমঃশূদ্র জাতির ইতিহাসকে স্বতন্ত্র ভাবে দেখানো হয়নি।

বাবুল কুমার পাল তাঁর *'বরিশাল থেকে দণ্ডকারণ্য পূর্ববঙ্গের কৃষিজীবী উদ্বাস্তুর পুনর্বাসন ইতিহাস', গ্রন্থ মিত্র, ২০১০* বইটিতে পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তু নমঃশূদ্রদের পুনর্বাসন, বাংলা রাজনীতিতে দলিত নমঃশূদ্র জাতির ভূমিকা বিশেষ করে যোগেন্দ্রনাথ মন্ডলের ভূমিকা এছাড়া বামপন্থী আন্দোলনের সঙ্গে নমঃশূদ্র জাতির জড়িয়ে পড়া, দণ্ডকারণ্যে পুনর্বাসন, মরিচঝাঁপির ঘটনা তুলে ধরেছেন। বইটিতে নমঃশূদ্র জাতির সার্বিক উদ্বাস্তু আন্দোলনের চিত্র পাওয়া যায় না।

শেখর বন্দ্যোপাধ্যায় ও অনুসূয়া বসু রায়চৌধুরীর '*In search of space The Scheduled Caste Movement in West Bengal after Partition', Mahanirban Calcutta Research Group, 2014,* প্রতিবেদনটিতে ভারতভাগ পরবর্তী পশ্চিমবঙ্গের অনুসূচিত জাতি গুলির উদ্বাস্তু রাজনৈতিক আন্দোলন সম্পর্কে লিখেছেন। লেখাটিতে উদ্বাস্তু রাজনীতির এক খন্ড চিত্র উঠে এসেছে।

অন্যান্য আলোচ্য গবেষণায় প্রাসঙ্গিক গ্রন্থ সমূহগুলি হল- চিত্ত মন্ডল ও প্রথমা রায়মন্ডল সম্পাদিত, *'বাংলার দলিত আন্দোলনের ইতিবৃত্ত' (একুশ শতক, কলকাতা, ২০১৬)।* রূপ কুমার বর্মণ এর লেখা *'Yes! The Scheduled Castes Can Write: Reflections on the Creative and Assertive Writings of the Scheduled Castes of*

Colonial Bengal', New Delhi, sage Publications, ২০১৬, 'Partition of India and the scheduled castes of Bengal: A Historiographical Perspective', Voice of Dalit Vol. 5, No. 2, 2012, pages 215-237, রূপ কুমার বর্মণ ও যুথিকা বর্মার লেখা *Conversing More and Functioning Less: A Study of Reservation Policy of India with Special References to the Scheduled Castes of West Bengal (2008)' Voice of Dalit Vol.*1, দেবী চ্যাটার্জির লেখা *মানবাধিকার ও দলিত, ২০১৪,* প্রভৃতি প্রকাশিত গবেষণামূলক গ্রন্থ এবং লেখনি সমূহ প্রস্তাবিত গবেষণার ক্ষেত্রে অপরিহার্য পথনির্দেশিকা।

উপরোক্ত পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, ইতিপূর্বে নমঃশূদ্রদের ইতিহাস লেখার ক্ষেত্রে ঔপনিবেশিক পর্বের সমাজ ও শিক্ষা সংস্কার আন্দোলনের ইতিহাস লেখা হয়েছে। অপরদিকে ১৯৪৭ সালের দেশভাগ পরবর্তী ইতিহাস লেখার ক্ষেত্রে দেশভাগ ও উদ্বাস্তু সমস্যার উপর ইতিহাস রচিত হয়েছে। কিন্তু ১৯৪৭ সাল পরবর্তী নমঃশূদ্র জাতির পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস আলোচনায় জাতি চেতনা, জাতি রাজনীতি ও সামাজিক অবস্থানের কার্য-কারণ সম্পর্ক স্থাপনের প্রয়াস পরিলক্ষিত হয়নি। নমঃশূদ্র জাতির ইতিহাস লেখার এই অপূর্ণতা পূরণের ক্ষেত্রে, প্রতিপাদ্য গবেষণা পত্রটি সহায়ক হবে।

গবেষণা প্রকল্প:

প্রস্তাবিত 'বিভাজিত বাংলা ও উত্তর-পূর্ব ভারতে জাতি চেতনার বিবর্তন: নমঃশূদ্র জাতির একটি আলোচনা (১৯৪৭-২০২১)' শিরোনামের গবেষণা কর্মটিতে, ১৯৪৭ এর দেশ বিভাজনের পরবর্তী সময় থেকে ২০২১ সালের পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচন পর্যন্ত নির্ধারিত সময় পর্বের মধ্যে সংগঠিত জাতি চেতনার মধ্য দিয়ে রাজনৈতিক পরিসরে উত্থান এবং তার

সঙ্গে সামাজিক অবস্থানের সম্পর্কটি কার্য-কারণের সম্পর্কের ভিত্তিকে উপজীব্য করে আলোচনা করা হয়েছে।

এই পর্যালোচনায়

১. বাংলা বিভাজন (১৯৪৭) তপশিলি তথা নমঃশূদ্র জনগোষ্ঠীর আত্মপরিচিতি, জাতি চেতনা এবং সামাজিক অবস্থানের আমূল পরিবর্তন ঘটাতে সক্ষম হয়েছে। নব গঠিত দুইটি ভিন্ন রাষ্ট্রীয় পরিকাঠামোয় তাদের জনবিন্যাস, কর্মসংস্কৃতি, অর্থনীতি ও সামাজিক চেতনাকে নতুন ধারায় প্রবাহিত করেছে।

২. ভারতীয় ভূখণ্ডে বসবাসকারী নমঃশূদ্র জাতির একটি বৃহত্তম অংশ পশ্চিমবঙ্গে অবস্থান করে আছে। তাদের মধ্যে একটি অংশের মানুষজন মতুয়াধর্ম অনুসারী। কিন্তু সর্বভারতীয় মতুয়া সংগঠন জাতীয় রাজনীতিতে সমগ্র নমঃশূদ্র জাতির প্রতিনিধিত্ব করে চলেছে।

৩. উত্তর-পূর্ব ভারতের আসাম, ত্রিপুরা প্রভৃতি রাজ্যে বসবাসকারী নমঃশূদ্র জনগোষ্ঠী আশির দশকের 'বাঙাল খেদা' আন্দোলনের পরিমণ্ডলে, তাদের স্বতন্ত্র জাতি পরিচিতি হারিয়ে সকল সঙ্কটাপন্ন বাঙ্গালীর একটি অংশ হয়ে উঠেছে।

৪. দেশভাগের (১৯৪৭) পর পূর্ব পাকিস্তানে থেকে যাওয়া হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে নমঃশূদ্র জনগোষ্ঠী পরিবর্তিত সাম্প্রদায়িক রাষ্ট্রীয় নীতি ও রাজনীতিক পরিমণ্ডলের কারণে, দলে দলে অভিবাসিত হয়ে ভারতে চলে আসে। ফলত: ওই অঞ্চলের জনবিন্যাসে এক বিপুল পরিবর্তন ঘটে যায়। এই পরিবর্তন তাদের বর্তমান বাংলাদেশের সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায়ের একটি অংশে পরিণত করেছে।

অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে যে, আলোচ্য গবেষণা প্রকল্পে নির্ধারিত তিনটি ভিন্ন স্থান ও রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে নমঃশূদ্র জাতি পরিচিতি ও জাতি চেতনার তিনটি ভিন্ন প্রেক্ষিত উঠে আসছে। এই ভিন্নতাপূর্ণ বিষয় সমুহকে উপজীব্য করে গবেষণা প্রকল্পটি পর্যালোচিত হয়েছে।

গবেষণার প্রশ্ন সমূহ:

ক. ১৯৪৭-এ বাংলা বিভাজনের মধ্য দিয়ে তপশিলি জাতি চেতনা কিভাবে সংকটাপন্ন হয়ে পড়ে ছিল?

খ. বাংলা বিভাজন (১৯৪৭) পরবর্তী পশ্চিমবঙ্গে নমঃশূদ্র জাতি ও মতুয়া রাজনীতির সমীকরণ কিভাবে সহাবস্থান করে আছে?

গ. ১৯৪৭ পরবর্তী ভারতের উত্তর-পূর্ব অংশে 'বাঙালি খেদা' আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে নমঃশূদ্র জাতি চেতনা কিভাবে বাঙালি পরিচিতিতে রূপান্তরিত হয়ে পড়েছে?

ঘ. বাংলাদেশের রাজনীতিতে নমঃশূদ্র জাতি কিভাবে হিন্দু সংখ্যালঘু পরিচিতি পুনর্গঠন প্রক্রিয়ার অংশ হয়ে উঠেছে?

ঙ. পশ্চিমবঙ্গ, উত্তর-পূর্ব ভারত এবং বাংলাদেশের নমঃশূদ্র জনগোষ্ঠীর জাতি চেতনার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে, তাদের সামাজিক অবস্থান কিভাবে বিবর্তিত হয়ে চলেছে? প্রভৃতি প্রশ্ন এই প্রস্তাবিত গবেষণার আলোচ্য বিষয়।

গবেষণার প্রকৌশল ও উপাদান:

গবেষণা সন্দর্ভটি লেখার প্রক্রিয়ায় প্রাথমিক উপাদান, ক্ষেত্র সমীক্ষা এবং প্রয়োজনীয় বিভিন্ন গ্রন্থের তথ্য এবং তত্ত্বের সহায়তায় আরোহী পদ্ধতি (Inductive Method) অবলম্বন করে গবেষণ কার্যটি অগ্রসর হয়েছে। প্রাথমিক উপাদান হিসেবে ঔপনিবেশিক বাংলার আদমশুমারি, বিভিন্ন জেলার গেজেটিয়ার এবং সরকারি প্রতিবেদন, বিভিন্ন আত্মজীবনী মূলক

গ্রন্থ ও সহকারী তথ্য মূলক প্রতিবেদন প্রভৃতি থেকে তথ্য নেওয়া হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের তপশিলি জাতির ওপর রূপ কুমার বর্মণ মহাশয়ের বৃহৎ গবেষণা প্রকল্প (Major Project) এর ক্ষেত্র সমীক্ষার সহকারি হিসেবে বিভিন্ন অঞ্চলের নমঃশূদ্র জাতির তথ্য ও সাক্ষাৎকার সংগ্রহ করে, তা পর্যালোচনা করার সুযোগ হয়েছে। পাশাপাশি কুচবিহারের আঙারাকাটা পায়রাডুবি, নাদিয়ার পলাশীপাড়া, কলকাতার ঠাকুরপুকুর, উত্তর ২৪ পরগণার ঠাকুরনগর অঞ্চলের ক্ষেত্র সমীক্ষার মাধ্যমে নমঃশূদ্র জাতির সামাজিক ও রাজনৈতিক বিবর্তন আকলন করার প্রয়াস করা হয়েছে।

প্রাথমিক উপাদান ও বিভিন্ন গ্রন্থ সংগ্রহের জন্য জাতীয় গ্রন্থাগার, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য মহাফেজখানা, রামকৃষ্ণ মিশন গ্রন্থাগার, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিসদ, Centre for Studies in Social Sciences Library, জাদুনাথ সারকার গ্রন্থাগার, দুর্গানগর আম্বাদকর মিশন, ঠাকুর নগর প্রকাশনী, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ও বিভাগীয় গ্রন্থাগার এছাড়া বাংলাদেশ জাতীয় মহাফেজখানা ও জাতীয় গ্রন্থাগার প্রভৃতির তথ্যের সহায়তায় গবেষণা পত্রের ভিত্তি যাচাই করে নেওয়া হয়েছে।

অধ্যায় বিন্যাস:

বর্তমান সন্দর্ভটি আলোচনার সুবিধার্থে পাঁচটি মূল অধ্যায়ে বিভক্ত করা হয়েছে। এছাড়া ভূমিকাতে গবেষণার প্রয়োজনীয়তা, সাহিত্য অভীক্ষা, উদ্দেশ্য, গবেষণা সম্বন্ধীয় প্রশ্ন, গবেষণার উপাদান, গবেষণা পদ্ধতি ও প্রতি অধ্যায়ের বিষয়বস্তু সংক্ষিপ্তভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

প্রথম অধ্যায়ে ভারতীয় সমাজে বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর অবদমনের প্রেক্ষাপট আলোচনা করা হয়েছে। এই প্রক্রিয়ায় চেতনার উত্থানের সঙ্গে কিভাবে কোন জনগোষ্ঠীর সামাজিক

অবস্থান বা পরিচিতি এবং মর্যাদার বিষয়টি পারস্পরিক কার্যকারণ বন্ধনে সম্পর্কিত রয়েছে, তা তুলে ধরা হয়েছে। এই আলোচনায় ভারতীয় জাতি ব্যবস্থার প্রচার ও প্রসার ঘটানোর ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধর্ম গ্রন্থের ভূমিকা উঠে আসতে দেখা যায়। ঔপনিবেশিক পর্বে পাশ্চাত্য শিক্ষা এবং সামাজিক ন্যায়ের ধারণার প্রসারের মধ্য দিয়ে এই সকল পশ্চাতপদ জনগোষ্ঠীর মধ্যে চেতনার উন্মেষ ঘটেছিল। এই চেতনা তাদের আত্মপরিচিতি অন্বেষণে পরিচালিত করেছিল।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে জাতি চেতনায় উদ্ভূত হয়, যে সকল সামাজিক ঊর্ধ্বগতিময়তার আন্দোলন গড়ে তুলেছিল, তা আলোচিত হয়েছে। এর পাশাপাশি বাংলার রাজবংশী, নমঃশূদ্র, পৌন্ড্র বাগদি, বাউরি, মালো, ধোপা, হাড়ি প্রভৃতি জনগোষ্ঠীর সামাজিক উত্থানের বিবরণ উঠে এসেছে। এই প্রেক্ষিতে মতুয়া আন্দোলনের মধ্য দিয়ে নমঃশূদ্র জনগোষ্ঠীর উত্থান এবং জাতি রাজনীতির বিষয়টি তুলে ধরা হয়েছে। ১৯৩৭ থেকে ১৯৪৭ মধ্যবর্তী পর্বে বাংলার রাজনীতিতে নমঃশূদ্র সম্পৃক্ততা তাদের জাতি রাজনীতিকে এক নতুন পরিচিতি এনে দিতে সক্ষম হয়েছিল, এই বিষয়টি উঠে এসেছে।

পরবর্তীতে দেশভাগের (১৯৪৭) মধ্য দিয়ে নমঃশূদ্র জাতি রাজনীতির এবং পরিচিতি নির্মাণের ক্ষেত্রে সংকট তৈরি হয়েছিল। এমত পরিস্থিতিতে তাঁরা বাস্তুচ্যুত হয়ে পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, ত্রিপুরা প্রভৃতি অঞ্চলে অভিবাসিত হয়ে পড়ে। এই ঘটনা ক্রমের মধ্যে দিয়ে তাঁদের নতুন সামাজিক অবস্থান বা পরিচিতি নির্মাণ শুরু হয়েছিল।

তৃতীয় অধ্যায়ে দেশভাগ (১৯৪৭) পরবর্তী পশ্চিমবঙ্গ রাজনীতিতে নমঃশূদ্র জাতির নব পরিচিতি নির্মাণের ক্ষেত্রে জাতি চেতনার ভূমিকা আলোচনা করা হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচনী রাজনীতিতে মতুয়া এবং নমঃশূদ্র জাতির পারস্পরিক দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়ে জাতি চেতনা ও জাতি রাজনীতির প্রেক্ষিত উঠে এসেছে। এক্ষেত্রে অবিভক্ত বাংলার জাতি রাজনীতির ভরকেন্দ্র পূর্ববঙ্গ থেকে পশ্চিমবঙ্গে স্থানান্তরিত হয়ে আসতে দেখা যায়।

চতুর্থ অধ্যায়ে উত্তর পূর্ব ভারতের আসাম এবং ত্রিপুরা রাজ্যে নমঃশূদ্র জাতির সামাজিক পরিচিতি নির্মাণের প্রেক্ষিত আলোচনা করা হয়েছে। আসামের ভাষা এবং নৃতাত্ত্বিক সংস্কৃতি রক্ষার আন্দোলনের প্রেক্ষিতে ক্ষেত্রে, তাঁরা হয়ে উঠেছে বহিরাগত বাঙালি জনগোষ্ঠীর অংশ।

পঞ্চম অধ্যায়ে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান এবং বর্তমান বাংলাদেশের থেকে যাওয়া নমঃশূদ্র জাতির সামাজিক অবস্থান আলোচনা করা হয়েছে। এই আলোচনায় দেখা যায় যে, নমঃশূদ্র জাতি রাজনীতির উত্থান ক্ষেত্র হিসেবে পরিচিত বর্তমান বাংলাদেশ এই জাতিটি হয়ে উঠেছে সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর অংশ। সে ক্ষেত্রে তাদের পূর্ববর্তী জাতি চেতনা তথা জাতি আন্দোলন অবলুপ্ত হয়েছে।

উপসংহারে আলোচ্য গবেষণার ক্ষেত্র হিসেবে পশ্চিমবঙ্গ, পূর্ববঙ্গ বা বর্তমান বাংলাদেশ এবং উত্তর পূর্ব ভারতের আসাম, ত্রিপুরা রাজ্য, এই তিনটি অঞ্চলে স্বাধীনতা পরবর্তী পর্বে নমঃশূদ্র জাতি চেতনার ইতিহাস লেখা হয়েছে। গবেষণার নিরীক্ষিণের মধ্য দিয়ে, এই তিনটি অঞ্চলে নমঃশূদ্র জাতি চেতনা ও রাজনৈতিক অবস্থানের তিনটি ভিন্ন প্রেক্ষিত উঠে এসেছে।

প্রথম ক্ষেত্র হিসেবে বাংলা বিভাজন (১৯৪৭) পরবর্তী পশ্চিমবঙ্গের প্রেক্ষিতে নমঃশূদ্র জাতিটি নদীয়া, উত্তর ২৪ পরগনা সহ বেশ কয়েকটি জেলার গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে শুরু করে, বিধানসভার ও লোকসভা নির্বাচনে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে ভোট রাজনীতির সমীকরণ প্রভাবিত করার সক্ষমতা, তাঁদেরকে একদিকে নাগরিক অধিকার ও জাতি রাজনীতি চর্চার অধিকার এনে দিয়েছে। অপরদিকে তাদেরকে করে তুলেছে অন্যান্য স্থানে বসবাসকরি নমঃশূদ্র জাতির মানুষের অভিভাবক।

দ্বিতীয় ক্ষেত্র হিসেবে উত্তর-পূর্ব ভারতের আসাম এবং ত্রিপুরা রাজ্যে নমঃশূদ্র জাতির প্রেক্ষিত উঠে এসেছে। রাজ্য দুইটিতে স্থানীয় অধিবাসীদের সঙ্গে বাঙালি জনগোষ্ঠীর নৃতত্ত্বগত

(Ethno Cultural) এবং ভাষা সংস্কৃতিগত দ্বন্দ্ব নমঃশূদ্র জনগোষ্ঠীকে জাতি সত্ত্বার পরিবর্তে ভাষা সত্ত্বা আরোপ করে, তাঁদের করে তুলেছে 'বহিরাগত বাঙালি'।

আবার ত্রিপুরা রাজ্যে দেশভাগ পরবর্তী অভিবাসনের ফলে, এখানকার জনবিন্যাস পরিবর্তিত হয়ে যাওয়ায়, বাঙালিরা হয়ে উঠেছে সংখ্যা গুরু। এই জনবিন্যাসগত পরিবর্তন ত্রিপুরার ভাষা সংস্কৃতিগত আন্দোলন তৈরি হওয়ার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছে।

তৃতীয় প্রেক্ষিত হিসেবে ঔপনিবেশিক শাসন পরবর্তী পূর্ব পাকিস্তান বা বর্তমান বাংলাদেশে অবস্থানকারী নমঃশূদ্র জাতির অবস্থান তুলে ধরা হয়েছে। ১৯৪৭ পরবর্তী পূর্ব পাকিস্তান বা বর্তমান বাংলাদেশের দীর্ঘকালীন ধর্মীয় অসহিষ্ণুতা এবং রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা নমঃশূদ্র জাতি চেতনাকে প্রান্তিকতার জায়গায় নিয়ে এসেছিল। এমতাবস্থায় একদা নমঃশূদ্র জাতির চেতনা উত্থানের ভিত্তি ভূমিতেই নমঃশূদ্র জাতি রাজনীতি অবলুপ্ত হয়েছে। এই প্রক্রিয়া বর্তমান বাংলাদেশে তাঁরা অবদমিত জাতি বা তপশিলি পরিচিতির পরিবর্তে সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর প্রতিভূ হয়ে উঠেছে।